বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬
www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No-A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা, ১৮-০৭-২০২২, পৃষ্ঠা- ০৪

আলোকপাত

ড. এ কে এনামুল হক

শ্রীলংকার অর্থনীতির ১৭টি গিরিখাদ

শ্রীলংকার অর্থনীতির দুর্দশা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। এর সঙ্গে অনেকেই তার কারণও খুঁজছেন। কেন এমনটি হলো? কারো মতে প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসের অপরিণামদর্শী কার্যক্রমের ফল এটি। কথায় বলে, হাতি খাদে পড়লে পিপীলিকাও কামড় দিতে সাহস পায়। তাই এখন আমরা নানাভাবে তার ব্যর্থতার কারণ খুঁজছি। তেমনি কার ওপর দোষ দিয়ে পার পাওয়া যায় সেই চেষ্টাও চলছে। অনেকেই দেখছেন প্রকাশ্য কিছু কারণ। যার মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট, তার পরিবার ও তাদের ক্ষমতা। ঘটনাক্রমে তাদের দায় যদিও একেবারে শূন্য নয়, তথাপি এককভাবে তাদের ওপর রোষ ঢেলে দিলেই যে রাতারাতি দেশ বিপদমুক্ত হবে তা বলা যায় না। তাই শ্রীলংকার অর্থনীতি নিয়ে এ আলোচনা।

শ্রীলংকার মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ১৫৬ ডলার। বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। সেখানে বাস করে মাত্র ২ কোটি ২০ লাখ লোক। দেশটির আয়তন বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম। তাই শ্রীলংকা যখন উত্তাল তখন তাকে বাংলাদেশের সঙ্গে সহজ তুলনা করা কতটুকু সঠিক হবে তা বলা মুশকিল। অতএব শ্রীলংকায় কী ঘটেছিল, আসুন তার ঘটনা পরম্পরা জেনে নিই। প্রথমত, শ্রীলংকা ২৫ বছর ৯ মাস যুদ্ধ করেছে। যার শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে, শেষ হয়েছে ২০০৯ সালে। এ যুদ্ধে তাদের ২০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। সাড়ে তিন লাখ লোক বাস্তুহারা হয়েছে। ৭০ হাজার লোক দেশটি ছেড়ে ভারতে গেছে শরণার্থী হিসেবে (যার মধ্যে ৫০০০ যুদ্ধের পর ফেরত এসেছে)। দ্বিতীয়ত, ২৫ বছর যুদ্ধের সময় সরকারকে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে। শ্রীলংকা যেহেতু উন্নয়নশীল দেশ, তাই তার ঋণ আমাদের মতো 'সহজ' শর্ত কিংবা নামমাত্র সুদে হয়নি। ১৯৮৯ সালেই শ্রীলংকার পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ছিল মোট জাতীয় আয়ের ৯০ শতাংশ। তৃতীয়ত, শ্রীলংকা দীর্ঘদিন ভারতের মুখাপেক্ষী ছিল তার বৈদেশিক বাণিজ্যে। গৃহযুদ্ধের একপর্যায়ে ভারত শ্রীলংকায় সৈন্যও পাঠিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজীব গান্ধী নিহত হওয়ার পর ভারত তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। শ্রীলংকার বাণিজ্যে ভারতের সঙ্গে ছিল বিশাল ঘাটতি। এ সময়ে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির কারণে শ্রীলংকা ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠনের চুক্তি করে। ভারতের ধারণা ছিল, এর ফলে ভারতীয় বিনিয়োগ শ্রীলংকায় যাবে আর তাতে দুই পক্ষই উপকৃত হবে। চতুর্থত, ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধকালীন সেদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসেনি। তাই সরকারকে সে সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য নির্ভর করতে হয়েছে তার জনশক্তি রফতানির ওপর। শেষদিকে গৃহযুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে সেখানে বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করেছিল শ্রীলংকা। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি কমাতে তা সাহায্যও করেছিল। পঞ্চমত, নব্বই দশক থেকেই আইএমএফ শ্রীলংকার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছিল। কারণ ছিল বিপুল ঋণ মূলত গৃহযুদ্ধ ও বিনিয়োগ বন্ধের কারণে হয়েছিল। শ্রীলংকার জন্য এসব কঠিন কঠিন শর্ত অগ্রহণযোগ্য ছিল। শ্রীলংকা তাই বিদেশী বিনিয়োগের অন্য সূত্র খুঁজছিল। এরই মধ্যে চীন এসে শ্রীলংকাকে সাহায্যের আশ্বাস দিল। শ্রীলংকার পূর্ব উপকূলে হাম্বানটোটায় একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হলো।

মনে আছে, কানাডার এসএনসি লাভালিনের কথা? ২০০৩ সালে সেই এসএনসি লাভালিন হাম্বানটোটা গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের কাজটি করে। যাচাই কাজের অর্থ আসে কানাডা থেকে। তবে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে বিশ্বব্যাংক এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে আসে চীন। ৬ দশমিক ৩ শতাংশ সুদের হারে ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের এ প্রকল্পটি শ্রীলংকা গ্রহণ করে। চীনের এ বিনিয়োগে উৎসাহী হওয়ার তিনটি কারণ ছিল। এক. চীন এ সময়ে অনুধাবন করছিল, ভবিষ্যতে তার বাণিজ্যের পথে বিষফোঁড়া হিসেবে দাঁড়াবে দক্ষিণ চীন সাগর। এখানে মার্কিনিরা তাদের সহজে ছাড় দেবে না। চীনের মতো একটি বড় রাষ্ট্রের জন্য তাই বিকল্প পথ খোঁজার প্রয়োজন ছিল। দুই. তারা সিঙ্গাপুরের বিপরীতে একটি নতুন বৃহৎ বন্দর তৈরিতে আগ্রহী ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক্ষেত্রে চীন মিয়ানমারের সিটউই বন্দরটি ব্যবহার করে দক্ষিণ চীন সাগরের যেকোনো উত্তেজনায় নিজের দেশ ও অর্থনীতিকে রক্ষা করবে। তিন. দক্ষিণ এশিয়ার বড় কোনো সমুদ্রবন্দর নেই। তাই আমদানি-রফতানিতে বড় বড় জাহাজ নোঙর করে সিঙ্গাপুর বন্দরে। সেখান থেকে ছোট ফিডার জাহাজের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশকে পণ্য আমদানি রফতানি করতে হয়। আগামীতে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি পৃথিবীর একটি বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হলে তাদের পক্ষে সিঙ্গাপুরভিত্তিক বাণিজ্যনীতি কাজ করবে না। সে সময় ২০২৫-৩০ সালের মধ্যে হাম্বানটোটা হবে দক্ষিণ এশিয়ার রটারড্যাম বন্দর, যা একসময় ইউরোপের গেটওয়ে হিসেবে কাজ করেছিল। অবশ্য তা বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রীলংকাকে সিঙ্গাপুরের মতো আর্থিক নিয়ম-কানুন তৈরি করতে হবে। ষষ্ঠত, ২০১০ সালে হাম্বানটোটা পোর্টটির প্রথম ধাপের উদ্বোধন হয়। জাহাজ আসে মিয়ানমারের সেই সিটউই বন্দর থেকে। পশ্চিমা বিশ্ব তখনই ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়। তাই শুরু হয় নতুন বৈরিতার। কী করে শ্রীলংকা থেকে চীনকে হটানো যায়! সপ্তমত, প্রায় একই সময় শ্রীলংকা গৃহযুদ্ধে 'জয়ী' হয় (২০০৯ সাল)। রাজাপাকসে ও সিরিসেনা (সেনাপ্রধান) রাতারাতি হিরো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। অষ্টমত, গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই শ্রীলংকায় চীনা বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। চীনা বিনিয়োগের প্রধান লক্ষ্য ভারতীয় বাজার। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে শ্রীলংকা ভারতের বাজারে বিনা শুল্কে রফতানির অধিকার রাখে। চীনা বিনিয়োগের ফলে শ্রীলংকা থেকে ভারতে রফতানি বাড়তে থাকে। একসময় তা ঘাটতি বাণিজ্য থেকে রূপান্তরিত হয় উদ্বৃত্ত বাণিজ্যে। ভারতীয়দের কাছে তা খুব একটা সুখের সংবাদ ছিল না। শুরু হয়, চীনবিরোধী প্রচারণা। ততদিনে সবাই ভুলে যায় অতীতে কারা শ্রীলংকাকে ঋণ দিয়েছিল। কাদের দায়দেনা শোধের জন্য শ্রীলংকা চীনের দ্বারস্থ হয়েছিল। প্রচারণার লক্ষ্য ছিল চীনা বিনিয়োগকে জনগণের কাছে সব সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা। অপরিপক্ক শ্রীলংকাবাসীসহ অনেকেই তা বিশ্বাস করতে শুরু করে। নবমত, শ্রীলংকার সরকার বুঝতে পারে, শ্রীলংকার প্রয়োজন নতুন বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের উৎস। শ্রীলংকায় বিদেশী পর্যটকের আনাগোনা বহুদিনের। জার্মানিসহ ইউরোপীয় পর্যটকরা শ্রীলংকায় সবসময়ই আগ্রহী ছিল। তাই রাজাপাকসে তৈরি করেন নতুন অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা। যার মূল লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন। রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার, নতুন হাইওয়ে প্রভৃতি খাতে উন্নয়নের ফলে বিদেশী পর্যটকের বিচরণ ক্ষেত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলে তাতে একদিকে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং একই সঙ্গে বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার। শুরু হয় মেগা প্রকল্পের কাজ। বিনিয়োগ এবারো আসে চীন থেকে। কারণ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের অতীত দেনা নিয়েই বেশি চিন্তিত। দশমত, মেগা প্রকল্পগুলোর পরিচালনা ও বিনিয়োগে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। সরকারের সব পর্যায়েই রাজাপাকসে পরিবারের দৌরাত্ম্য দেখতে পাওয়া যায়। একপর্যায়ে রাজাপাকসেকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে সিরিসেনা। তিনিই গৃহযুদ্ধে জয়ী সেনাপ্রধান। তিনিও যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। একাদশতম, শুরু হয় চীনা দেনা শোধের পালা। শ্রীলংকায় সরকার পরিবর্তনের ফলে কেউ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়নি। হাম্বানটোটা বন্দরের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য কেউ-ই উৎসাহী হননি, কারণ বন্দরটি ছিল রাজাপাকসের নিজ অঞ্চলে।

শ্রীলংকার মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ১৫৬ ডলার। বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। সেখানে বাস করে মাত্র ২ কোটি ২০ লাখ লোক। দেশটির আয়তন বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম। তাই শ্রীলংকা যখন উত্তাল তখন তাকে বাংলাদেশের সঙ্গে সহজ তুলনা করা কতটুকু সঠিক হবে তা বলা মুশকিল

এদিকে প্রচারকদের লক্ষ্য চীনা দেনাকে সব সমস্যার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই নতুন সরকারও একটি মুক্তবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য আইন-কানুন তৈরিতে সাহসী হয় না। একই সঙ্গে মিয়ানমারে শুরু হয় অদৃশ্য হাতের কারসাজি। সেই সিটউই বন্দরের কার্যক্রমে বাধা হয়ে ওঠে রোহিঙ্গা আন্দোলন। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো কংগ্রেসম্যান দাবি করলেন, রোহিঙ্গা-অধ্যুষিত অঞ্চলকে প্রয়োজনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ততদিনে পৃথিবীতে নতুন দেশ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। জাতিসংঘ ততদিনে স্থাপন করেছে দক্ষিণ সুদান, পূর্ব তিমুর, যুগোস্লাভিয়াকে ভেঙে তৈরি হয়েছে অনেক রাষ্ট্র। অতএব, রোহিঙ্গার আবাসস্থলকে মিয়ানমার থেকে আলাদা করে যুক্ত করা যাবে বাংলাদেশের সঙ্গে। এক ঢিলে দুই পাখি। চীনের তৈরি হাম্বানটোটা বন্দর আপাতত অচল হবে, দেনার দায় বাড়বে, চীনই বেকায়দায় পড়বে। আর একই সঙ্গে চীনের বাণিজ্যতরীর মিয়ানমার হয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হবে এবং সিঙ্গাপুর বা দক্ষিণ চীন সাগরের বিকল্প পথও চীনের জন্য আপাতত বন্ধ। দ্বাদশতম, চীন আপাতত তাদের দায় নিজ কাঁধে নেয়ার পরিকল্পনা করে। তারা বুঝতে পারে, পশ্চিমা বিশ্ব দৌড়ে একধাপ এগিয়ে। তাই দেনার দায়ের অভিযোগ এড়ানোর জন্য শ্রীলংকাকে পাল্টা প্রস্তাব দেয়। বন্দরটি আমাদের লিজ দিয়ে দাও। তোমাকে কোনো কিছু এখন শোধ করতে হবে না। শ্রীলংকা রাজি হয়ে যায়। শ্রীলংকার মোট ঋণের ১৩ শতাংশ চীনের। এ দায় আর থাকবে না। বন্দরটি এমনিতেই ক্ষতির কারণ হয়েছে। শ্রীলংকা বাকি ৮৭ শতাংশ পশ্চিমা ঋণের দায় শোধ করতে সচেষ্ট হতে পারবে। সংবাদমাধ্যম কিংবা গবেষকরা কিন্তু এখন কথা ঘুরিয়ে হাম্বানটোটাকে হংকংয়ের সঙ্গে তুলনা করল। তারা বললেন না, পশ্চিমা বিশ্ব হংকং ও কাউলুন জোর করে দখল করে চীনা রাজাকে দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিল, দেনার দায়ে নয়। তারা করেছিল তাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য। অথচ এখানে ঘটেছে ঠিক উল্টোটি। দায় থেকে শ্রীলংকাকে অব্যাহতি দিয়ে আপাতত আরো এক দশক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও চীন বন্দরটি নিজের হাতে রাখে। হয়তোবা তারাও কোনো অংক কষছে মিয়ানমার নিয়ে! ত্রয়োদশতম, ঋণের দেনার দায় বাড়তে থাকায় শ্রীলংকা কার্যত তার বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার হারাতে থাকে। তারই মধ্যে রাজাপাকসেকে শ্রীলংকার জনগণ আবারো ক্ষমতায় বসায়। ক্ষমতায় এসে রাজাপাকসে বুঝতে পারে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ না থাকায় তার পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব না।

এদিকে তার ক্ষমতার চারপাশে আবারো জড়ো হয় আত্মীয়-স্বজন। চতুর্দশতম, শ্রীলংকা সরকার ভাবতে থাকে কী করে তার বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার রক্ষা করা যায়? বাংলাদেশের মতো প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ না থাকায় তাদের দেশে কৃষির জন্য সার আমদানি করতেই হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের চাপে কিংবা কারো অতিউৎসাহে শ্রীলংকা সরকার ঘোষণা দেয় দেশের কৃষিকে পরিবেশসম্মত বা জৈব কৃষিতে রূপান্তরের। তাতে সার আমদানি নিষিদ্ধ হয় কিন্তু কৃষি উৎপাদনও প্রায় ২০ শতাংশ কমে যায়। নতুন চাপ সৃষ্টি হয় খাদ্য আমদানিতে। অর্থাৎ সারের অর্থ বাঁচাতে তৈরি হয়েছে খাদ্য ঘাটতির। সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। জনরোষ বাড়তে থাকে এ অপরিপক্ব কিংবা অতিউৎসাহী সিদ্ধান্তের কারণে। কথায় বলে দেয়ালে পিঠ ঠেকলে হুঁশ থাকে না। এবার সরকার সার আমদানি সম্পূর্ণ বেসরকারি পর্যায়ে ছেড়ে দেয়। সারের দাম আরো বাড়তে থাকে। সে সঙ্গে বাড়ে খাদ্যদ্রব্যের দাম। পঞ্চদশতম, ২০২০ সাল। শুরু হয় করোনা। বন্ধ হয় পর্যটন কেন্দ্র। শ্রীলংকার মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১০ শতাংশের বেশি এ খাতে উৎপাদিত হয়। এর অধিকাংশ ছিল বৈদেশিক মুদ্রায়। সবই বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীলংকার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মাইনাস ৩ দশমিক ৫ শতাংশ হয়। মন্দার প্রভাবে দেখা দেয় কর্মহীনতা। পর্যটন একটি বিশাল সেবা খাত। উঠতি শিক্ষিত যুবকের অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত। করোনায় তারাও চাকরি হারায়। কৃষকের সঙ্গে যুবকরা একাত্ম হয়। সরকার দিশেহারা। দেশ বাঁচানোর জন্য তারা হাত পাতে প্রতিবেশীদের কাছে। সংগত কারণেই ভারত সাহায্য এড়িয়ে যায়। এগিয়ে আসে বাংলাদেশ। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাতে খুব একটা লাভ হয় না। একবারের সুদের দেনার আংশিক শোধ হয় মাত্র। জ্বালানি ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়। এতদিনে শ্রীলংকার পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ (চীনের হাম্বানটোটা বন্দরের ঋণ ব্যতীত) জাতীয় আয়ের ৯৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ষোড়শতম, কভিড-পরবর্তী দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ায় সরকার করহার কমিয়ে দিয়ে জনগণের স্বস্তির ব্যবস্থা করেছিল। তাতে সরকারের সাহায্য করার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। কারণ, সরকারের আয় কমে যায়।

জেনে রাখা ভালো, শ্রীলংকার করআয় জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ হয়ে যায়। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা অপ্রতুল (আমাদের করআয় জাতীয় আয়ের ৯-১০ শতাংশ মাত্র)। ক্রমে সরকারের গরিব জনগণকে সাহায্য করার ক্ষমতাও কমে আসে। টাকা ছাপতে পারে না। কারণ, তাতে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে। একই সঙ্গে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সরকারের সামরিক খাতের খরচ বেড়ে যায়। সপ্তদশতম, শুরু হয় রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ। হু হু করে বেড়ে যায় তেল, সার ও খাদ্যশস্যের দাম। অবস্থা শ্রীলংকার অনুকূলে থাকে না। একদিকে কর সংগ্রহে ব্যর্থতা, অন্যদিকে অধিক মূল্যস্ফীতির ফলে টাকা ছাপিয়ে সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার অক্ষমতা এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রার অভাব শ্রীলংকাকে বিপদে ফেলে। হাতের কাছে তখন একজনই আছে। প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে। তাকে ধরতে হবে। তিনিই সব কিছুর মূলে। উন্নয়ন কিংবা গৃহযুদ্ধ জয়ের মতো বীরত্বগাথা কাহিনী জনগণ ভুলে যায়। মনে আছে রফিক আজাদের সেই বিখ্যাত উক্তি? 'ভাত দে হারামজাদা নচেৎ মানচিত্র খাব' এখানেও তাই হয়েছে। রোষানলে পড়েন রাজাপাকসে। অথচ এ সময়ে অন্তত সাতজন প্রেসিডেন্ট দেশটির শাসক ছিলেন। তবে রাজাপাকসেরও অনেক ভুল ছিল। তিনি কেবল তার পরিবারকেই বিশ্বাস করতেন। স্লোগান দিয়ে, আবেগতাড়িত করে যুদ্ধে জেতা যায় কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন পরিপক্ব চিন্তা। প্রয়োজন দক্ষ উপদেষ্টা দল। যাদের উদ্দেশ্য ইয়েস মিনিস্টার হওয়া নয়, তোষামোদ করা নয়। উপদেষ্টাদের খোলামেলা বিতর্ক রাষ্ট্রনায়ককে সঠিক চিন্তা করতে সহায়তা করে। এ উপমহাদেশে মোগল সম্রাট আকবর পঞ্চদশ শতাব্দীতেই তা শিখিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। পড়তেও পারতেন না। কিন্তু তার চারপাশে রেখেছিলেন বুদ্ধিমান উপদেষ্টা দল। যাদের সুবুদ্ধি তাকে দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিল। এ উপদেষ্টারা মন্ত্রী ছিলেন না, তাদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। তারা ছিলেন কেবলই উপদেশদাতা। রাজাপাকসে এক, দুই করে মোট ১৭টি গিরিখাদে পড়ে গিয়েছিলেন। তাকে রক্ষা করা সম্ভব না, তবে তার ব্যর্থতা থেকে আমাদের শেখার আছে।

ড. এ কে এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ও পরিচালক এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট